আদাবু তালিবুল ইলম ৭তম এবং ৮ম দারস

•আলোচনার বিষয়বস্তু

১। অনলাইনে ইলম অর্জনে ছাত্র-ছাত্রীদের করণীয় ও বর্জনীয় কিছু বিষয় ।

২। আলিমগণের মতভেদের কারণ এবং এ ব্যাপারে ত্বলিবুল ইলমের করণীয় ।

অনলাইনে ইলম অর্জনে ছাত্র-ছাত্রীদের করণীয় ও বর্জনীয়

মূলত ত্বলিবুল ইলমদের জন্য অনলাইন ও অফলাইনে একই ফিতনা আজ বিরাজ করছে। তাই এখানে আমরা ২টি এমন পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো কেবলমাত্র অনলাইনের জন্যই নির্দিষ্ট বলা যেতে পারে।

১। ঘনঘন ড্রপআউট হয়ে যাওয়া:

দ্বীন শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষত অনলাইনে ড্রপআউট হয়ে যাওয়ার সমস্যাটা প্রকট। অধিকাংশ কোর্সের ক্ষেত্রে দেখাযায় প্রথমে অনেকজন শুরু করলেও কিছুদিন পরই শিক্ষার্থীর সংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে থাকে, অতপর শেষের দিকে প্রায় একেবারেই কমেযায়। স্বল্পমেয়াদী কোর্সের চাইতে দীর্ঘমেয়াদী কোর্সে ড্রপআউট এর হার অনেক বেশি থাকে। এজন্য প্রয়োজন যে কোনো কোর্সের সাথে আন্তরিক ভাবে লেগে থাকা।

২। ঘনঘন এক কোর্স থেকে আরেক কোর্সে জাম্প করা প্রসঙ্গে :

আমরা প্রায়ই যে কোনো একটা কোর্সে থাকা অবস্থায় তা শেষ না করেই অন্য একটা কোর্সে চলে যাই। এই ঘনঘন কোর্স বদল করাটা খুবই কমন একটা সমস্যা। এতে করে যা হয় - আমরা ইলমের ক্ষেত্রে একই জায়গায় পড়ে থাকি, আগাতে পারিনা। এজন্য আমাদের ঘনঘন কোর্স বদল না করে একই জায়গায় সম্পূর্ণ কোর্স শেষ করা উচিৎ, এরপর অন্য কোথাও কোর্স শুরু করা উচিৎ।

অনেক মেধাবী আছে যারা একসাথে একাধিক কোর্স চালু রাখতে পারে এবং সবগুলোতে সফলও হয়। এমন অতি মেধাবীদের কথা ভিন্ন। কিন্তু আমাদের উচিৎ নির্দিষ্ট একটি জায়গাতেই লেগে থাকা। যে সত্যিকার অর্থেই এক জায়গাতে লেগে থাকবে, সে অনেক ভালো শিখবে। আর যে একটার পর একটা কোর্স বদল করতে থাকবে, দীর্ঘ সময় পরেও তাদের জ্ঞান থাকবে ভাসা-ভাসা।

লক্ষ্যণীয়: একজন ত্বলিবুল ইলম অফলাইন ছেড়ে অনলাইনের দ্বারস্থ হবে দুইটা শর্তে ।

- যখন অফলাইন মাদ্রাসার পক্ষ থেকে সুযোগ থাকলেও আমাদের পক্ষ থেকে সুযোগ থাকেনা।
- অনেক সময় আমাদের সুযোগ থাকলেও মাদ্রাসাতে সুযোগ থাকেনা।

তখন আমরা অনলাইনে ইলমের দ্বারস্থ হব। কিন্তু যদি নিকটস্থ কোনো মাদ্রাসাতে পড়ার সুযোগ হয়ে যায়, তবে অবশ্যই আমরা অফলাইনেই পড়ব। তখন অনলাইনে ছোট-খাট কোর্স করতে পারি, তবে দীর্ঘমেয়াদী কোর্সের জন্য উচিৎ অফলাইনে ভর্তি হয়ে যাওয়া - যদি সম্ভব হয়।

আলিমগনের মতভেদের কারণ ও এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় :

এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; কারণ ইতিপূর্বে আমরা যত আদবের বিষয় শিখেছি তার মধ্যে ইখতিলাফি বা মতভেদপূর্ণ বিষয়ের উপযুক্ত কার্মপদ্ধতি যদি আমাদের জানা না থাকে তাহলে সকল আদবই ব্যর্থ হবে।

আলেগণের মতভেদের কারণঃ

আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা থাকে যে আমরা যদি কেবল কুরআন ও সুন্নাহের দিকে ফিরে এসে তা মেনে নেই তাহলে কোনো রকম ইখতিলাফ থাকবে না; এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আমরা যদি ইসলামের ইতিহাস দেখি তাহলে আমরা বুঝবো যে রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবিতবস্থাতেই সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিলো। তাই আমাদের মধ্যে যাদের ধারণা যে, কেবল কুরআন ও সুন্নাহের উপর একত্রিত হলেই সকল ইখতিলাফ দূর হয়ে যাবে তারা অধিকাং ক্ষেত্রে সূরা নিসার ৫৯ আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করেন।

تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر ذلك خير و أحسن تأويلا

"যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হও, তাহলে তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের কাছে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা বিশ্বাস রাখো আল্লাহ এবং কেয়ামত দিবসের উপর তাহলে এটাই হবে কল্যাণকর এবং পরিণামে সুন্দর। " [সূরা নিসা – ৫৯]

কিন্তু বোঝার বিষয় হচ্ছে এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা বলছেন যে আমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যাপারে বিবাদের সৃষ্টি হয় তাহলে আল্লাহ ও রাসূল অর্থাৎ কুরআন এবং সুন্নাহের দিকে ফিরে গেলে আমাদের বিবাদের সমাধান হয়ে যাবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে تنزعتم শব্দটি বিবাদ অর্থে প্রকাশ করছেন; ইখতিলাফকে নয়।

সুতরাং বিবাদ দূর হওয়া আর ইখতিলাফ দূর হওয়া এই দুটোর মধ্যে কিন্তু মোটা দাগে পার্থক্য আছে। এখানে যারা ধরে নিয়েছেন বা বলছেন যে تنازعتم আর اختلاف সমার্থক শব্দ তারা মূলত ভুল ধারণায় নিপতিত হয়েছেন যে কুরআন ও সুন্নাহ একত্রিত হলেই সমগ্র মুসলিম উম্মাহের মধ্যে থেকে বিভেদ চলে যাবে। এছাড়াও তাদের ধারণা যে যতক্ষন আমরা ফিকহের মধ্যে থাকবো,

ফিক্বহ কেন্দ্রীক পড়াশুনা হলে বা ফিক্বহ থেকে মাসা'লা গ্রহণ করলে ইখতিলাফ দূর হবেনা। মূলত এটা একটা ভুল ধারণা।

যখন দুইটা দলের মধ্যে বিবাদ হয় তখন একটা দল থাকে হক্বের উপরে ও আরেকটি দল থাকে বাতিলের উপরে; একপক্ষ থাকে জালেম ও আরেক পক্ষ থাকে মাজলুম।

সুতরাং, কুরআন ও সুন্নাহের ফয়সালা যদি মেনে নেয়া হয় তাহলে কুরআন ও সুন্নাহ সবসময় মাজলুমের পক্ষে রায় দিবে। এজন্য কুরআন ও সুন্নাহের ফয়সালা মেনে নেয়া হলে বিবাদ দূর হয়ে যাবে এ কথা ১০০ ভাগ সঠিক। কিন্তু যখন ইখতিলাফ অর্থাৎ মতভেদ (মতামতের ভিন্নতা) হয় তখন একটা হক্ব ও আরেকটা বাতিল এমন নয় বরং ইখতিলাফের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই হক্ব ।এখানে শুধু দুই পক্ষের মধ্যে বিভিন্ন কারণে মতের পার্থক্য হয়েছে।

যখন উভয় পক্ষ-ই হক্ব তখন - এখানে কুরআন ও সুন্নাহ ও তো হক্ব তাহলে কুরআন ও সুন্নাহের মধ্যে ফিরে আসলে দুই হক্বের মধ্যে কিভাবে সমাধান হবে ? এটা ভুল কথা কারণ কুরআন ও সুন্নাহের থেকেই দুই পক্ষের হক্ব প্রমাণিত হয়েছে। বরং কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আরোহিত জ্ঞানের মাধ্যমে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে ইখতিলাফ হয়েছে। এখানে হক্ব ও বাতিলের মধ্যে ইখতিলাফ হয়নি বরং উভয়টাই হক্বের মধ্যে থেকে ইইখতিলাফ হয়েছে। কুরআন এবং সুন্নাহের নস/মতোন (Text) থেকে ইইখতিলাফ এসেছে। সুতরাং, এটা বলার কোনো সুযোগ নেই যে কুরআন ও সুন্নাহ এই দুটো মেনে নিলেই সকল ইখতিলাফ মুছে যাবে ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একমতের উপর চলে আসবে।

উদাহরণ হিসেবে আমার যদি দেখি যে, সাহাবায়ে কেরামের যামানায় আল্লাহর রাসূল (স.) যখন সাহাবিদেরকে বললেন তোমরা বনু কুরাইজার এলাকায় না গিয়ে আসরের সালাত আদায় করবেনা। তখন মদিনা থেকে বনু কুরাইজায় গিয়ে ওখানে পথে আসরের সালাত হয়েগেলে এমনকি ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাচ্ছিল। তখন একদল সাহাবায়ে কেরাম তারা বললেন যে আল্লাহর রসুল সাঃ এর এ কথা বলার দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল যে, জোর তাগিদ দেয়া যেন ওখানে গিয়ে সালাত পড়া ।যেহেতু ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাচ্ছে সেহেতু আমরা এখানেই সালাত আদায় করে নেই , সালাত কাযা করবো না। আরেক দল সাহাবি বললেন যে, রাসূলের কথার দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল ওখানে গিয়েই পড়তে হবে, পথে পড়া যাবেনা। সুতরাং ওয়াক্ত শেষ হলেও আমরা বনু কুরাইজায় গিয়েই পড়ব। পরবর্তীতে মদীনায় ফিরে আসার পরে যখন উভয় দলের সাহাবিরা আল্লাহর রাসুলের সাঃ কাছে মতামত পেশ করলেন । তখন আল্লাহর রাসুল (সা.) চুপকরে থাকলেন । তিনি কোনো দলকেই হক ঘোষণা করলেন না বা কিছু বললেন না। সুতরাং এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে আল্লাহর রাসূল (স.) উভয় দলের মতভেদকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

আমরা আরেকটা হাদীস থেকে জানতে পারি যে, "আল্লাহর রসুলের জীবদ্দশাতেই উমার (রা.) এবং হিশাম বিন হাকিম (রা.) তাদের মধ্যে সাময়িক একটা ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল।

সেটা হলো কোরআনের ক্বিরাত নিয়ে । হিসাম বিন হাকিম (রা.) একভাবে তেলাওয়াত করছেন, তো উমার (রা.) বলছেন এইভাবে নয় বরং এইভাবে পড়তে হবে। পরে উমার (রা.) হিসাম বিন হাকিম (রা.) কে ধরে আল্লাহর রাসুলের সাঃ কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন - আল্লাহর রাসূল!! দেখুন সে কোরআনকে বিকৃত করে পড়ছেন।

তখন আল্লাহর রাসুল সাঃ বললেন যে - ঠিক আছে তুমি তেলাওয়াত করো। তিনি তিলওয়াত করলে রাসূল সাঃ শুনলেন, তিনি বললেন যে "হাকাযা আনঝালাত" এভাবেই কোরআন নাযিল হয়েছে।

আরেকটা হাদিসের মধ্যে এসেছে,

"আল্লাহর রাসূল উমারকেও পড়তে বললেন এবং হিশামকেও পড়তে বললেন এবং বললেন যে তোমরা দুজনেই ঠিক পড়ছো। তাই তোমরা পড়তে থাক, অর্থাৎ উভয় ক্বিরাতই শুদ্ধ।"

আমরা জানি যে কুরআন ৭ টি ক্বিরাতে পড়া যায় । আমরা যে ক্বেরাতে তেলাওয়াত করে থাকি তা হলো কুরাঈশি তিলাওয়াত। বাকি ক্বিরাত গুলো ব্যাপক ভাবে পঠিত হয়না , ওগুলো একাডেমিক আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়েগিয়েছে । তবে ওই সময় কিন্তু এগুলো প্রচলিত ছিলো ও আল্লাহর রাসুল সাঃ এর সময় ৭ টি ক্বিরাতেই কুরআন পড়া হতো। আল্লাহর রাসুল সাঃ এখানে তাদের উভয়কেই অবকাশ দিয়েছেন।

এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি, এই ইখতিলাফ বলি বা মতভেদ বলি বা মতপার্থক্য বলি, এগুলো স্বয়ং রসূল (সাঃ) এর সময় থেকেই ছিল এবং আমাদের সালফে সালেহীনগন এই মতভেদকে আমাদের উম্মাতের জন্য রহমত মনে করতেন , উম্মাতের মধ্যে বিভেদের কারন মনে করতেন না।

কারন মতভেদের জন্য তাদের কর্মপন্থা ছিল এক আর আমাদের কর্মপন্থা 'উল্টেগেছে'। এজন্য আমরা শারয়ী ইখতিলাফারে ক্ষেত্রে আমাদের মতভেদগুলোকে বিরোধের কারন মনে করছি।

অথচ ইমাম সুয়ুতি (রঃ) বলছেন যে, ইসলামে মাযহাবগুলোর মধ্যে পার্থক্য অনেক বড় কল্যাণ, বিশাল অনুগ্রহ। এখানে সূক্ষ্ম এমন বিষয় রয়েছে যা কেবল আলিমগনই বোঝেন।

আরেকজন আলিমের এরকম বক্তব্য রয়েছে যে,ওলামাগনের মধ্যে মতের মিল আমাদের জন্য অপরিহার্য প্রমান। তাদের মধ্যে মতের অমিল বিরাট মেহেরবানি। তারমানে যখন ওলামাগনের মধ্যে ইজমা হয়ে যাবে একটা বিষয়ে তখন এটা উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়। আর যখন তাদের মধ্যেই খতিলাফ হয় তখন এটা আমাদের জন্য মেহেরবানি হয়ে যায়। তবে এ প্রসঙ্গে একটা হাদিস এসেছে যেখানে আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেন যে, " আমার উম্মতের মতভেদআশীর্বাদ স্বরুপ।"

কিন্তু এই হাদিসটি সহীহ না। অনেকের মতে এই হাদিসটা জাল, আল্লাহর রাসূলের এমন কোনো বক্তব্য নেই।

তবে ওলামাগনের পক্ষ থেকে এবং সালফে সালেহীনদের পক্ষ থেকে এমন সঠিক বক্তব্য পাওয়া যায়। সহীহ সূত্রে পাওয়া যায় যে, সালফে সালেহীনগন ওলামায়ে কেরামগনের মতভেদকে সম্মানের চোখে দেখেছেন, আমাদের জন্য এটাকে মেহেরবানি হিসাবে দেখেছেন।

আশাকরি উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে ইখতিলাফ সম্পর্কে ভুল ধারণা থাকলে তা স্পষ্টহবে।

❖ কোন কোন বিষয়ে মতভেদ হবে

কখনো কখনো প্রশ্ন আসে যে যেকোনো বিষয়ে যে কেউ একাধিক মত দিলেই কি সেটা গ্রহন যোগ্য হয়ে যাবে ? না ! যে বিষয়ে মতভেদ করার সুযোগ রয়েছে সরল দৃষ্টিকোন থেকে সেই বিষয়েই কেবল মতভেদ করা বৈধ। এই বিষয়গুলোকে বলা হয় " মুজতাহাদ ফীহি"। মুজতাহাদ ফীহি মানে হচ্ছে যে বিষয়ে ইজতিহাদ করার সুযোগ রয়েছে।

কোন কোন বিষয়ে মতভেদ করার সুযোগ রয়েছে জানতে হল আমাদের ২টি বিষয় জানতে হবে।

* একটা হচ্ছে – ক্বত্বয়ী قطعى

* আরেকটা হচ্ছে – জন্নি ظنى

ক্বত্বয়ী হচ্ছে – অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত, যার কোনো ব্যাখ্যার অবকাশ নেই।

জন্নি হচ্ছে – স্বার্থবোধক বা যার একাধিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এবং এর নির্ভরযোগ্যতা ও অর্থ, জাচাই-বাছাই করা সম্ভব যে এটা কি সহীহ না জঈফ বা এর অথেনটিসিটি কতটুকু ?

আরেকটা হচ্ছে যে, অর্থের ব্যাখাটা কেমন বা অর্থটা কি বুঝাচ্ছে ?

তবে “নির্ভরযোগ্যতা” এবং “অর্থ” এই দুটো বিষয় কে ক্বতয়ী এবং জন্নীর দর্পনে রেখে ওলামায়েকেরাম সিদ্ধান্ত নিতেন।

ক্বত্বয়ী এবং জন্নী বিষয়কে আমরা চার ভাবে পেতে পারে। অর্থাৎ এর মোট চার প্রকার হয়।

১. হতে পারে কোনো একটার বর্ননা, কোনো একটা হাদিস বা মাসআলার “নির্ভরযোগ্যতা” এবং “অর্থ” উভয়টাই ক্বত্বয়ী। অর্থাৎ এটা নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে যেমন অকাট্য এতে কোনো সন্দেহ নেই , তেমনই দ্বিতীয় কোনো মত প্রকাশ করারও সুযোগ নেই।

অর্থটাও এমনি অকাট্য যে দ্বিতীয় কোনো ব্যাখ্যারও সুযোগ নেই। এই বিষয়গুলো নিয়ে ওলামাগণের মধ্যে অমিল থাকতে পারবেনা এবং আমাদের সালফে সালেহীন ওলামায়ে কেরামগণও কেউ কখনও করেননি।

এই বর্তমানযুগে কেউ যদি এসবে মতের অমিল করে বুঝতে হবে সে **গোমরাহীর প্রচার করছে।**

যেমন... পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ " এটা নিয়ে আল্লাহর রাসুল সাঃ এর জামানা থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত কোনো ওলামায়ে কেরাম কোনো সাহাবায়ে কেরাম এর মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এর ফারজিয়াত নিয়ে কোনো সন্দেহ ছিলনা। এখন যদি কেউ বলে যে সালাত তিন বা চার বা ছয় ওয়াক্ত ফরজ তাহলে নিশ্চিত ভাবে সে গোমরাহীর প্রচার করছে।

এখানে কিন্তু নির্ভরযোগ্যতা বা অর্থ উভয়টি ক্বত্বয়ী বা অকাট্য। এমনই মদ , সুদ হারাম হওয়া, আল্লাহ তায়ালার একত্বে শরীক নিষিদ্ধ হওয়া, রাসুল সাঃ এর রিসালাত, নবুওয়াত এই যে বিষয়গুলো নির্ভরযোগ্যতা ও অর্থের দিক দিয়ে ক্বত্বয়ী এবং যে কেউ এই ক্বত্বয়ী ধরনের নির্ভরযোগ্য বিষয়গুলোর উপর দ্বিমত পোষণ করলে বুঝতে হবে সে গোমরাহীর পথে হাঁটছে।

২. দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, ক্বত্বয়ী যে নির্ভরযোগ্য তাতে কোনো সন্দেহ নাই। তবে অর্থগত দিক থেকে এটা জন্নী হয়ে যাবে।অর্থ্যাৎ নির্ভরযোগ্যতাকে তো সন্দেহ করার কোনো সুযোগ নাই। বরং এর বিশুদ্ধতা নিয়ে যে সন্দেহ করবে সে গোমরাহীর মধ্যে পড়বে।

যেমন- কোরআনের আয়াত যা কতয়ী বা অকাট্য। কোরআনের কোনো একটি আয়াত সম্পর্কে এইযুগে এসে কেউ যদি বলে এটি কোরআনের আয়াত নয় বরং পরবর্তী সময়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাহলে সে গোমরাহ। যেমন- 'শিয়া'রা একটি ফারিক (দল) বলে কোরআন মোট ৪০ পারা। তারা কিন্তু কোরআন নির্ভরযোগ্যতার মানে “ক্বত্বয়ী দলিলের” বিপক্ষে কথা বলছে। তারা বলছে কোরআনের ১০ পারা অতিরিক্ত আছে যা সাহাবায়ে কেরাম গোপন করেছেন। এটা নিসন্দেহে একটা গোমরাহী মূলক কথা। এখন আমরা বলতে পারি এর নির্ভরযোগ্যতা পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ বা ক্বত্বয়ী হলেও এর ব্যাখ্যাটা দ্ব্যর্থবোধক বা জন্নী হতে পারে ।তখন একাধিক সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে এবং মতভেদের সুযোগ হয়ে যায়। কোরআন মাজীদে সূরা বাকারার ২২৮ নং আয়াতের মধ্যে একটি আয়াত আছে যে

" তালাক প্রাপ্ত নারী অপেক্ষা করবে তিন কুরুপর্যন্ত। "

এখন এই কুরু বলতে কি বোঝানো হয়েছে ? এটা বোঝাতে হানাফী ওলামায়ে কেরাম বলছেন, কুরু অর্থ হায়েজ। অর্থাৎ তিনটি পূর্ণহায়েজ অতিক্রম হওয়া পর্যন্ত তারা ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে।

পক্ষান্তরে শাফেয়ী ওলামায়ে কেরাম বলছেন, তিনটি পবিত্রকাল পুরোপুরি শেষ হওয়ার পর পর্যন্ত তারা ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে।

এখানে কুরু বলতে তিনটা হায়েজ নাকি তিনটা পবিত্রকাল বোঝাচ্ছে এটা নিয়ে কোনো ক্বত্বয়ী বা অকাট্য দলিল কিন্তু কোরআন হাদিসের অন্যকোন জায়গায় বা আরবি ভাষার প্রচলিত নিয়মে বা কোন হাদিসের মধ্যে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়না। সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই বিষয়ে ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে।

এজন্য এখানে যেহেতু আয়াত রয়েছে কুরআন মাজীদের তাই এর নির্ভরযোগ্যতা ক্বত্বয়ী হয়েগেল । কিন্তু এর ব্যাখার বিষয়টা হয়েগেল জন্নী। সুতরাং এখানে একটা মতভেদ হয়ে গিয়েছে এবং এটি একটি বৈধ মতভেদ।

৩.এরপর তৃতীয় বিষয়ে নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারটা হয়ে যেতে পারে জন্নী অর্থাৎ এটা দ্ব্যর্থবোধক।

কেউ বলেছেন নির্ভরযোগ্য, কেউ বলেছে নির্ভরযোগ্য না কিন্তু এর অর্থটা বা ব্যাখ্যাটা হল ক্বত্বয়ী। এখানে কোন দ্বিতীয় ব্যাখ্যার অবকাশ নেই।

যেমন...আমরা বলতে পারি নামাজে ইমামের পিছনে ক্বিরাত পড়ার বিষয়টা । ইমামের পিছনে কেরাত পড়ার যে হাদীসগুলো এসেছে এর ব্যাখ্যাটা কতয়ী। আবার কোনো একটা হাদীসে এসেছে।–

"ইমামের ক্বিরাতই মুক্তাদির তিলাওয়াত"

তাহলে এখানে দেখেন এক্ষেত্রে অর্থটা অকাট্য; দ্বিতীয় কোন ব্যাখ্যার অবকাশ নেই যে ইমামের পিছনে মুক্তাদী ক্বিরাত পড়বে কি পড়বেনা। এখানে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে "ইমামের ক্বিরাতই মুক্তাদির কিরাত " কিন্তু এটা সহীহ কিনা যদিও অনেক অনেক ওলামায়ে কেরাম এটাকে সহীহ বলেছেন এবং এটা মুয়াত্তা মালিকে বিশুদ্ধসূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু আবার কিছু কিছু ওলামায়ে কেরাম জঈফও বলেছেন।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম এর নির্ভরযোগ্যতা ক্বত্বয়ী হয়নি যদিও এর ব্যাখ্যাটা ক্বত্বয়ী। অর্থাৎ নির্ভরযোগ্যতা জন্নী হয়ে গিয়েছে (ব্যাখ্যা সাপেক্ষে হয়ে গিয়েছে)। এবং এটা জন্নী কেন ? কারণ যে হাদিসটা আমাদের কাছে পৌঁছেছে এটা কিন্তু মুতাওয়াতির হাদিস না , কুরআনের আয়াততো নয়-ই। অর্থাৎ ক্বত্বয়ী হচ্ছে “কোরআনের আয়াত” বা “মুতাওয়াতির হাদিস” অর্থাৎ যে হাদিস প্রতিটি স্তরের এত বেশি সংখ্যক রাবী (বর্ণনাকারীর) দ্বারা বর্ণিত হয়েছে যে, এতগুলো মানুষের মিথ্যার উপর একত্রিত হওয়া অসম্ভব। তাই এই হাদিসটি খবরে ওয়াহেদ। অর্থাৎ প্রতিটি স্তরের এত সংখ্যক সাহাবী দ্বারা বর্ণিত হয়নি যে এটা মুতাওয়াতির পর্যায়ে চলে যায়। মুতাওয়াতিরের চেয়ে কম সংখ্যক মানুষ দ্বারা বর্ণিত হওয়ার কারণে এটা খবরে ওয়াহেদ। তখন এর নির্ভরযোগ্যতাটা ক্বত্বয়ী হয়না, এর নির্ভরযোগ্যতা জন্নী হয়ে যায়। আবার উপরন্তু এতে মতভেদও রয়েছে। এজন্য এর সাথে কিছু হাদিস রয়েছে যা আপাতদৃষ্টিতে সাংঘর্ষিক মনে হয়।

যেমন...এক হাদীসে এসেছে বুখারীর মতে,

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে ইমামের পিছনে মুক্তাদী ক্বিরাত পড়বে কি পড়বেনা ? এর উত্তরে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, পড়বে।

তিনি বললেন, যখন ইমাম সশব্দে তেলাওয়াত করবে ?

আবু হুরায়রা বললেন, তখনও পড়বে।"

এখন আমরা দেখলাম যে দুইটা হাদিসের মধ্যে এটাও সহীহ হাদিস যা বুখারীর মধ্যে এসেছে আবার মুয়াত্তা মালিকের মধ্যেও বিশুদ্ধসূত্রে এসেছে "ইমামের ক্বিরাতই মুক্তাদির ক্বিরাত "|

এখন এর নির্ভরযোগ্যতা যেহেতু জন্নী হয়ে গিয়েছে এজন্য হানাফী মাযহাব মতে যখন কেউ একাএকা সালাত পড়বে তখন সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা "ওয়াজিব" |আর শাফেয়ী মাযহাব মতে "ফরজ"| আবার শাফেয়ীদের মতে হলো ইমামের পেছনে যখন থাকবে তখন কিরাআত জোরে হোক , আস্তে হোক মুক্তাদী পড়বে, সবসময়ই পড়বে। কিন্তু হানাফি উলামায়ে কেরামের মতে ইমামের পেছনে যখন মুক্তাদী থাকবে তখন তারা ক্বিরাত পড়বেনা, ইমামের ক্বিরাতই যথেষ্ট হয়ে যাবে। মুয়াত্তা মালিকের হাদিসের উপর তারা আমল করে আর শাফেয়ীরা আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীসের উপর আমল করে।

তাহলে আমরা দেখতে পেলাম, যখন নির্ভরযোগ্যতা জন্নী হয়ে যায় কিন্তু অর্থ এবং বাক্য ক্বত্বয়ী থাকে তখন একটা মতভেদের সুযোগ থাকে। যা বৈধ মতভেদ |

৪. এরপর চতুর্থ যে কেইসটা হতে পারে তা হলো : নির্ভরযোগ্যতা ও অর্থ উভয়টাই জন্নী হয়ে যায়, তখন এখানে অবশ্যই একটা বড়সড় ব্যাখ্যার সুযোগ থাকে।

যেমনঃ একবার রাসূল (সা) এর কাছে কেউ জিজ্ঞেস করলো যে, ওযু থাকলে পরের বার ওযু করার সময় চামড়ার মোজার উপরে মাসেহ করা যাবে কিনা। তো আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন,

"হ্যা,যাবে। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এটা কি একদিনের জন্য ? রাসূল (সা) বললেন :হ্যা| তারপর আবার বললেনঃ দুইদিন ? রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ |আবার বললেনঃ তিনদিন ? আল্লাহর রাসূল বললেনঃ 'হ্যা, যতদিন তোমার দরকার'|"

তারমানে কি এই যে, আমি বাড়িতে থাকি বা সফরে থাকি দশদিন/বারোদিন/পনেরোদিন এক মোজার উপরে মাসেহ করবো ?

হাদিস থেকেতো তাই মনে হচ্ছে যে, আল্লাহর রাসূল একদিন, দুইদিন, তিনদিন কে সমর্থন দিয়ে বলছেন, "হ্যাঁ তোমার যতদিন দরকার" মানে তোমার যতদিন ইচ্ছা তুমি মাসেহ করে যাও।

বিষয়টা আসলে এমন নয় বরং আপনারা ফিকহের মধ্যে পড়েছেন, মুক্বীম অবস্থায় একদিন একরাত এবং মুসাফির অবস্থায় তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত মোজার উপরে মাসেহ করার সুযোগ থাকে। এরপর একদিন একরাত পার হয়ে গেলে মোজা খুলে নতুন ভাবে অজু করে আবার মোজা পরতে হবে। কিন্তু আপনি যখন একবার অজু করে মোজাটা পরবেন এরপর একদিন একরাত আপনার মোজা না খোলার সুযোগ থাকবে, আর মুসাফিরের ক্ষেত্রে তিনদিন তিনরাতের হিসাবে হবে ।

এখন যদি, এই হাদিসের ব্যাখ্যাটা কেউ শুধুমাত্র টেক্সট পরে সিদ্ধান্ত নেয়া শুরু করে যে, "হ্যা যতদিন তোমার দরকার" মানে দশ/পনের/বিশদিন যদি অজু না করার সিদ্ধান্ত নেয় আর ভাবে যে শুধু মোজা খুলব আর পরব, খুলব আর পরব – তাহলে এটা ভুল হবে এবং চরম ভুল হবে।

তাই এ হাদিসের ব্যাখ্যাটা হচ্ছে দ্ব্যর্থবোধক, এখানে ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। ব্যাখ্যাটা হলো জন্নী এবং এই হাদিসটা ও "খবরে ওয়াহেদ"। অর্থাৎ প্রতিটি স্তরে অল্পকিছু সংখ্যক সাহাবী হাদিসটা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং হাদিসটা সহিহ হলেও এটা খবরে ওয়াহেদ। একারণে এটা কতঈ অর্থ দিবেনা, এটা জন্নী অর্থ দিবে। তাহলে এখানে আমরা দেখলাম এ হাদিসের নির্ভরযোগ্যতা এবং অর্থ উভয়টাই জন্নী। সুতরাং এই বিষয় গুলোতে ইখতিলাফের সুযোগ রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা ৪টি বিষয় দেখলাম।

* "নির্ভরযোগ্যতা" ও "অর্থ" উভয়টাই ক্বত্বঈ হয়ে যায় তখন ব্যাখ্যার কোনো সুযোগ থাকেনা। কিন্তু একটিও যখন জন্নী থাকবে, দ্ব্যর্থবোধক থাকবে তখন সেখানে ব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে, বৈধ ইখতিলাফ রয়েছে। এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি/ছাড়াছাড় কোটাই করা যাবেনা। অর্থাৎ নির্ভরযোগ্যতা এবং অর্থ উভয়ই ক্বত্বঈ হলে ব্যাখ্যার কোন সুযোগ নেই।

* নির্ভরযোগ্যতা কত্বঈ কিন্তু অর্থট ও ব্যাখ্যাটা জন্নী হলে এখানে ইখতিলাফ হতে পারে।

* নির্ভরযোগ্যতা জন্নী কিন্তু অর্থটা ক্বত্বঈ, এখানেও মতভেদ বা ইখতিলাফ হতে পারে।

* আবার নির্ভরযোগ্যতা এবং অর্থ উভয়টাই জন্নী,এখানেও মতভেদ বা ইখতিলাফ হতে পারে।

তাহলে আমরা মূলকথা এবং একেবারে বুনিয়াদি বিষয় জানলাম যে, কেন উলামায়ে কেরানের মধ্যে মতভেদ হয়ে থাকে এবং এই জন্নী বিষয়গুলো মধ্যে অসংখ্য-অগণীত বিষয় আমাদের শরীয়তের মধ্যে আছে। এ ধরনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা সাপেক্ষ এবং জন্নী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

যেমন... নামাজে কোথায় হাত বাঁধা হবে, কেউ বলেছে বুকের উপর, কেউ নাভি বরাবর, কেউ বলেছে নাভির উপরে, কেউ বলেছে নাভির নিচে।

রমাদানের মাস শুরুর হিসাবটা কিভাবে হবে অর্থাৎ কতজনের চাঁদ দেখাটা এখানে নিয়ম হবে।

তারাবীর নামাজ আসলে কত রাকাআত।

দাঁড়ি কতটুকু লম্বা হবে, এটা কি একমুষ্টি রেখে দেয়া যথেষ্ট নাকি পুরোপুরি ছেড়ে দিতে হবে।

তারপর হচ্ছে হুয়ালের নিচে প্যান্ট পরার বিষয়টা। এটা কি অহংকার করে পরলে জাহান্নামী হবে নাকি এমনি ঝুলিয়ে পরলে ও জাহান্নামী হবে। এই আরো অনেক বিষয় নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে যে মতভেদ বা ইখতিলাফ আছে যা এগুলো জন্নী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত |

❖ ইখতিলাফি আলোচনায় ত্বলীবুলইলমের করণীয়

মতভেদগুলো একেবারে যুগযুগ থেকে চলে আসছে |এমন নয় যে কেবলমাত্র সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে বলে থাকে যে এতদিন কোন মতভেদ ছিলনা | বিগত ১০০ বছরে বা ৫০/৬০ বছর আগে আমাদের আরবের উলামায়ে কেরাম এই মতভেদ শুরু করেছে। এটা সম্পূর্ণ ভুল ও অমূলক ধারণা | সাহাবায়ে কেরামের যামানা থেকেই মতভেদ হয়ে আসছে। তাই এই মতভেদগুলোর জন্য সাম্প্রতিক উলামায়ে কেরামের দোষ দেয়াটা অনেক বড় একটা ভুল এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ কাজ|

অনেকে বলে থাকে যে কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক চর্চা ছিলোনা তাই বিদআত চর্চা হয়ে আসছে এই কথা কিন্তু ঠিক নয়।

এই ইখতিলাফি বিষয়গুলোতে এক পাক্ষিক আমলগুলো যুগযুগ ধরে চলে আসছিলো কিন্তু বর্তমানে আরেক পক্ষের আলোচনা বা প্রচারণা সামনে আসায় আমাদের মনে হচ্ছে এই বিষয়গুলো হয়তো কখনো ছিলোনা। অথচ সত্য এটাই যে এই বিষয়গুলো শতশত বছর ধরে চলে আসছে।

সুতরাং, এই ইখতিলাফ গুলোকে নতুন ফিতনা,ষড়যন্ত্র বা দ্বীন ধ্বংসের কারণ - এ ধরনের কোনো মানসিকতা লালন করা উচিত নয়|

* তাহলে কেন এখন আমাদের মনে হচ্ছে যে, এগুলো আমাদের দ্বীন ধ্বংসের কারণ ?
কারণ মতভেদ গুলো কিভাবে গ্রহণ করবো তা আমরা জানিনা। তাছাড়াও মতভেদগুলো কেন হয়েছে ও তাও জানিনা। (কি যে জানিনা তাও জানিনা – এমন একটা অবস্থা)

তাই আমাদের জানামতের বাইরে কেউ কোনো মত দিচ্ছে শুনলে তা গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক দ্বীধা কাজ করে যে, আমার অমুক শাইখ বা অমুক উস্তাজা তো এসব বিষয় আমাদের সাথে আলোচনা করেননি বা বলেননি।

এখন তারা বলেননি মানে এই নয় যে এই মতের কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই গাইরে আলেম বা আওয়াম হিসেবে ইখতিলাফ মতভেদগুলোকে নিয়ে বাড়িবাড়ি না করে, স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নেয়া। আর এই ইখতিলাফ মতভেদগুলো আমরা তখনই মেনে নিতে পারবো, যখন জানতে পারবো

আমাদের ওলামায়ে কেরাম যারা ইলমের প্রতিটি শাখায় এত বড় বড় খেদমত করে গিয়েছেন তারা শতশত বিষয়ে সহবস্থান করেছেন, ইখতিলাফ মতভেদগুলো নিয়ে একজন আরেক জনের সাথে বিদ্বেষ বা হিংসা পোষণ করেননি।

এখন যদি আমাদের আকবিরীন এবং সালফে সালেহীনগণ স্বয়ং নিজেরা যারা মতগুলো দিয়েছেন, তাদের মধ্যে যদি মতভেদ নিয়ে সমস্যা না হয়ে থাকে তাহলে আমরা বিভিন্ন ঘরানার ব্যাক্তিরা তাদেরই মতগুলোকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হব কেন?

বর্তমানে বিভিন্ন ঘরানার ব্যাক্তিদের মধ্যে অনেক ওলামা আছেন, যারা সত্যিকার অর্থে অনেক গভীর জ্ঞান রাখেন, অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে মুজতাহিদ পর্যায়ের আলেম। তো তাদের অনুসারী ভাই বোনেরা যদি তাদের ইজতেহাদের সত্য অনুসরণ করেন তাহলে তো আমাদের নিষেধ করার কোনো কারণ নেই। তবে দুঃখের বিষয় যে আমাদের প্রত্যেক ঘরানার মধ্যে কেউ কেউ এমন মনে করেন যে, আপনি আমাদের মাযহাবের অনুসরণ না করলে গোমড়া হয়ে যাবেন বা আমাদের মতের বাইরে যাওয়া যাবেনা !!! অবাক হওয়ার মত এক ব্যাপার !!!

আদতে তারাও নিজ নিজ নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরামদের ফলো করছেন তাই আমাদের এখানে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি বা বিদ্বেষ পোষণ কোনটাই উচিত নয়।

উসূলে ফিক্বহে অনেক ভাগ রয়েছে ; যেগুলো থেকে একেক জন ওলামায়েকেরাম একেক রকম মতামত দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। একই দলীল কারো কাছে সহীহ, আবার কারো কাছে কিনায়াহ, একই দলীল কেউ বলছেন হাক্বীকি অর্থে, কেউ বলছেন মাযাজ অর্থে।
তাই প্রত্যেকের উচিত উসূলুল ফিক্বহের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা, যাতে করে বুঝতে পারি যে কেন মতভেদগুলো রয়েছে এবং কিভাবে মতভেদগুলো গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরী করবো।